শেষ বাইজি

শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের গল্প

রক্তের ধারাটা দোতলার ঘরটির চৌকাঠ ডিঙিয়ে, বারান্দা অতিক্রম করে, সিঁড়ি বেয়ে একতলার উঠোনে এসে পড়ে ক্রমে উঠোন পেরিয়ে রাস্তায় নেমে যখন বড়ো রাস্তায় দিকে এগোতে থাকল দু-চারজন পথচারী আমরা খুন! খুন! চিৎকারে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লাম ঘটনার সাক্ষী হওয়ার অপরিহার্য বাসনায়। রক্তের ধারা দেখলেই 'খুন!' বলে রব তুলতে হবে এমন কোনো কথা নেই। খুন!' ডাকটা প্রথম তুলেছিলাম আমি, কারণ এমনতর রাস্তায় রক্তপাত মানেই খুন, মানে প্রচন্ড কেচ্ছা। উপরন্তু বসন্তের উজ্জ্বল, পরিচ্ছন্ন সূর্যালোকে রক্তের রংটাকে খুব লাল ও নাটকীয় ঠেকছিল। গত তিন বছরে এ পাড়ায় আমরা কোনো হত্যা দেখিনি; টুকরো-টাকরা, দৈনন্দিন রক্তপাত কিছু ঘটেছে, তবে যেরকম খুনখারাপি হলে পাড়াসুদ্ধ সবাই আমরা কিছুদিন ধরে প্রবল উত্তেজনায় দিন কাটাই, নিজেদের কথাবার্তাতেই নিজেরা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তেমন ঘটনা কিছু সত্যিই ঘটেনি। গত বছর একটি মেয়ে গলায় দড়ি দিয়েছিল বটে, তারও কিছুদিন আগে গায়ে আগুন দিয়ে মরেছিল আরেকজন, কিন্তু প্রবল রক্তপাতের যে একটা অদ্ভুত আস্বাদ আছে তা পুরো

তিন বছর পর এই প্রথম আমরা পেতে চললাম। আমি উঠোন অব্দি পৌঁছে ফের গলা ফাটিয়ে হাঁক দিলাম 'খুন!'

এ পাড়ায় মেয়ের সংখ্যা বড্ড বেশি, আর কেউই কোনো ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। খুনের মড়ার পাশে গিয়েও আগে আগে ভিড় করবে তারা। লীলাই প্রথম মড়াটার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বিশ্রী গলায় চিল্লোতে লাগল, আইব্বাস! ভগোয়ান ইয়ে কা হুয়া, রানি খুন হো গিয়া। ওই আওয়াজে বারান্দায় ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ানো ক-টি মেয়েও মর গয়া! মর গয়া বলে লাফিয়ে লাফিয়ে কাঁদতে লাগল। এটা যে কোনো দুঃখের কান্না নয় তাও পৃথিবীর কারও জানতে বাকি নেই। দুঃখ বলে কোনো অনুভূতি এই সব মেয়েছেলেদের নেই। যেকোনো অজুহাতে গলা দিয়ে জোরে আওয়াজ করা এদের স্বভাব। আমি ওদের একটাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে বললাম, অ্যাই, চপ! মেয়েটা একটু ঘাবড়ে গিয়ে থেমে গেল, তারপর খুব অবাক হয়ে ধরা গলায় আস্তে আস্তে বলল, শংকরলালবাবু, আপ?

সবাই জানে শরিফ আদমি শংকরলালবাবুর এপাড়ায় আসার সময় এটা নয়। সমস্ত ভদ্রলোকের মতন তিনিও নেশা না করে এ-বাড়িমুখো হন না। সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা নিপাট বাবুটির এখানে আসার বাহানা হল গান। বাবুটি গান ভালোবাসেন, তবে এখানকার গানে ওঁর মন ওঠার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। শোনা যায় লোকটা নাকি কোথায়, কীসব লেখেন—আল্লাই জানেন। তোমাদের নিয়ে বই লিখছি, এমন কথা তিনি মাঝে মাঝেই বলতেন আগে, এখন সেসব নিয়ে উচ্চবাচ্য করেন না। খুব ভদ্র ব্যবহার বাবুটির, চোখ দুটিও খুব শান্ত, কিন্তু ওই শান্ত চোখে কামনা টলটল করছে সর্বক্ষণ। মেয়েরা বুঝতে পারে। গত এক বছর ধরে রানির সঙ্গে খুব ভাব যাচ্ছিল বাবুটির। ব্যাচেলার লোক, এঘরে ঢুকলে বাড়ি ফেরার নাম করতেন না। আর সব ভদ্রলোকের মতন কাকভোরে টুকটাক করে গলি পেরিয়ে বড়ো রাস্তায় গিয়ে

ট্রাম ধরতেন। রানির খুব ডাঁট হয়েছিল এই বাবুটির জন্য। সবাইকে বলত, বহুত পড়ালিখা আদমি হ্যাঁয় উনহোনে। মুঝে উমরাও জানকি কহানি শুনায়ে হ্যাঁয় কই দফে! খুব ঘনিষ্ঠ বান্ধবী কয়েকজনের কাছে সে এও কবুল করেছিল যে বাবুটির যৌন পিপাসা নাকি অসীম। দস্যু লুঠেরার মতন তিনি প্রবেশ করেন নারীদেহে শরীর ও মন লন্ডভন্ড করার জন্য। রানির ভয়, বাবুটির মধ্যে একটা খুনের প্রবৃত্তি আছে।

বাইজি পাড়ার একটি গল্পের ব্যাপারে শঙ্করলালেরও খুব শখ। এখানকার বহু মেয়ের কাছে। সেই গল্পটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে শুনেছে। কাহিনিটা ছপ্পন ছুরির। একদিন এক বাইজিকে ছত্রাখান অবস্থায় পাওয়া গেল তার ঘরে, দেহে ছাপ্পান্নটি ছুরির ক্ষত। খুব সুন্দরী ছিল, প্রেমিকও ছিল প্রচুর, ছুরির ঘা থেকে বোঝা যায় হত্যাকারী গভীর প্রেমিক। শংকরলাল বহুবার প্রশ্ন করেও সঠিকভাবে জানতে পারেনি সেই খুনের ছুরিটা কীরকম ছিল। একবার বাজার থেকে তিনটি ছুরি কিনে সে ওখানকার মেয়েদের নিয়ে দেখিয়েছিল। ওই মেয়েগুলোই নাকি প্রথম আবিষ্কার করেছিল হতভাগিনী বাইজির দেহটি। ছুরিটা পড়েছিল দেহের পাশেই। রক্তে ধুয়ে গেলেও ছুরির চেহারাটা খুব স্পষ্ট ছিল। দৃশ্যটা দেখেই নীনা বলে উঠেছিল, ইয়ে কাম সেলিমনে কিয়া, ইয়ে ছোরি উসকি। অথচ সেই নীনাই কিছুতে মনস্থির করতে পারল না শংকরলালের ছুরিগুলো দেখে। একবার বলে এটা, একবার বলে ওটা, একবার সেটা। প্রতিটি মেয়েরই একটা নিজস্ব বর্ণনা ছিল খুনের ছুরিটা সম্পর্কে, কারও সঙ্গে কারও মেলে না। এর মধ্যে একটি মেয়ের বর্ণনা ছিল আরও অদ্ভুত। সে বলল, পুলিশ এসে ছুরিটা তুলে নিয়ে যাবার পরও সমানে চোঁ চোঁ করে রক্ত পড়ছিল ছুরির থেকে। এত রক্ত পান করেছে যে ছুরি, তা দিয়ে গড়াবে তো বহু রক্ত। আর অপর একটি মেয়ে জানকী দাবি করেছিল যে পুলিশের নেওয়া ছুরিটা দিয়ে খুন হয়ইনি। আড়ালে ডেকে একদিন বলেছিল জানকী, বাবু, ওই ছুরিতে খুন হয়নি। খুন হয়েছে এই ছুরিতে। বলে ন-ইঞ্চি

ফলার একটা সাদামাটা কসাইয়ের ছুরি ওর হাতে তুলে দিয়েছিল জানকী। সাপের লকলকে জিভে যে গা-শিরশিরে ব্যাপার থাকে তেমন কিছু একটা ছড়িয়ে ছিল ছুরিটায়। ছুরির বাঁটটা হাতে নিতেই একটা উষ্ণতা অনুভব করল শংকরলাল ওর হাতের পাঞ্জার মধ্যে। ওর কেনই জানি না মনে হল এ ছুরিতে কখনো না কখনো কোনো নরহত্যা হয়েছে।

জানকী এবার ওর পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বলল, খুনি সেলিম ছিল না বাবু। সেলিমের বড়ো প্রেম ছিল মেয়েটির সঙ্গে। খুন করেছিল। রাজা মুখার্জি, তোমার মতন খুব শরিফ লোক। খুব পিয়ার ছিল ফিরদৌসের সঙ্গে, কিন্তু বিয়ে করতে রাজি হয়নি। বাইজিকে ঘরে তুলবে না, শুধু ফুর্তি করবে। ফিরদৌস তখন সেলিমের সঙ্গে মিশতে লাগল। আর আমার কাছে এসে রাজার জন্য কাঁদত। এই খবর পেয়ে রাজাও এল আমার কাছে, আমার বাবু হল। খুনের পর এই ছুরি এনে আমায় দিল আর বলল, ধুয়ে-মুঝে যত্ন করে রেখে দাও। পরে নেব। তারপর অনেকক্ষণ চুপ থেকে জানকী বলল, আর আসেনি রাজা।

আমি ছুরিটা ওর থেকে কিনতে চাইলাম, জানকী বলল, তুমি এমনিই নিয়ে যাও বাবু। ওদিয়ে আমি কী করব? ছুরিটা আমি রেখে দিয়েছিলাম রানির কাছে। রানি ঠাট্টা করে বলত, এই দিয়ে শংকরলাল একদিন কোপ্তা করবে আমাকে। আমি তখন ছুরিটা ঘুরিয়ে দেখতাম। খুব অকারণ হিংসে হত অদেখা, অপরিচিত রাজা মুখার্জির ওপর। তখন নিজের মনেই হাসতে হাসতে বলতাম, হবে, টাইম আসুক।

আমার পিছন থেকে এবার এই বাড়ির এক নম্বর দালাল বশির হঠো সব! হঠো সব বলে ডাক ছাড়তে ছাড়তে আর দু-হাতে ভিড় করে দাঁড়ানো মেয়েদের দু-দিকে ঠেলে সরাতে সরাতে রানির ঘরে ঢুকে পড়ল। তখন পূর্ব

দিকের জানালা দিয়ে বল্লমের মতন ধারালো একখন্ড রোদ এসে ঘরের একটা অংশকে বিঁধেছে। রানির ঘরের সাদা ফরাস এখন রক্তজবার মতন লাল। ঘরের মুখোমুখি দেয়ালে মস্ত আয়নায় সেই লাল ফরাসের প্রতিবিম্ব হচ্ছে, দেয়ালের সবুজ রংকে মলিন করে দিয়ে গোটা ঘরটাকেই এখন একটা লাল চাদরে মুড়ে দিয়েছে রানির রক্ত। ঘরের চৌকাঠ অবধি এগিয়ে ভয়ে, বিস্ময়ে স্থির হয়ে গেল বশির, ওর মুখ দিয়ে শুধু বেরুতে পারল, হায়, আল্লা! তারপরও ওই চৌকাঠের ওপরেই বসে পড়ে ভেউ ভেউ করে ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগল। মেয়েদের কান্নার চেয়ে ঢের বেশি দুঃখ ছিল এই কান্নায়। বশির বসে পড়াতে ওর পিছনে দাঁড়িয়েও আমি রানির লাশটা দেখতে পেলাম ঘরের দক্ষিণ দিকের দেয়ালজোড়া আয়নার নীচে। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে যেন বসে আছে, আর গোটা গায়ে ছুরির গর্ত। গায়ের পোশাক ছুরিতে ছুরিতে ফালা ফালা হয়ে কতকগুলো ন্যাকড়ার মতন ছড়িয়ে আছে শরীরে। সমস্ত দেহে অক্ষত বলতে চোখ দুটো, যা ভয়ে, রাগে ও ভালোবাসায় এখনও জ্বলজ্বল করছে। চোখের মণি দুটো ভীষণ বড়ো হয়ে উঠেছে আর চোখের নীচে অশ্রুর রেখার পরিবর্তে দুটো চওড়া রক্তের ধারা গন্ডদেশ বেয়ে টপটপ করে গলার রক্তে এসে মিশেছে। রানির সমস্ত চুল এখন একটা রক্তের জটা আর তার প্রিয় আয়নাগুলোতে রক্তের মস্ত মস্ত ছিটে, যেন রাত্রে হোলি খেলা হয়েছে। কদিন আগে হোলির দিনেও এই আয়নাগুলোর একই দশা হয়েছিল। তবে সেসময় জায়গায় জায়গায় বাসন্তী আর সবুজ রঙের ছিটেও ছিল। আমি উৎসুক নেত্রে দেখতে চাইছিলাম খুনের ছুরিটা কোথায়, কীভাবে আছে, আমি মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সমস্ত ঘরটা দেখছিলাম। কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে কয়েক জোড়া চোখ ঘুরে ঘুরে শুধু আমাকে দেখছে দেখে আমি বিব্রত হলাম আর কিছুটা প্ররোচিত হয়েই এবার নিজের দিকে দেখলাম এবং এবারই প্রথম শিউরে উঠলাম ভয়ে ও আতঙ্কে। আমার সাদা পাঞ্জাবি রক্তে ধুয়ে যাচ্ছে, আমার হাতে রক্ত, একেবারে রানির রক্তের মতন রক্ত, আমার পাজামায় রক্ত, আর ডান হাতে ধরা রক্তমাখা একটা কালো বাঁটওয়ালা কসাইয়ের ছুরি। ফলাটা

ন-ইঞ্চিটাক হবে, আর তার গা দিয়ে সমানে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে আমার সামনে উবু হয়ে বসে থাকা বশিরের মাথায়। আমি গলা ফাটিয়ে আবার চিৎকার করে উঠলাম, খুন! খুন!

চিৎকার করেই শঙ্করলাল স্তব্ধ হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। ওর খেয়াল হয়েছে, পথচারীরা কেন তখন খুন! খুন! বলে ওর সঙ্গে গলা মিলিয়েছিল। বারান্দায় দাঁড়ানো বাইজিটির মুখে আপ, শংকরলালবাবু! কথাটার পুরো মানে ওর মনের ওপর ভেসে উঠল এখন। ওর একটু একটু করে মনে পড়ছিল গতরাত্রের একটা দৃশ্য। ও মেপে মেপে, জায়গা খুঁজে খুঁজে রানির দেহে একটার পর একটা ছুরির কোপ মারছে আর রানি কোপগুলো গুণে যাচ্ছে। এক... দো... তিন... সাত... আঠারো... বত্তিস... পচপন। রানি তৃতীয়বারে ছুরির ঘা খেয়ে বলেছিল, তোমার যতখুশি মারো বাবু শুধু চোখে মেরো না। আমি তোমায় দেখতে দেখতে মরতে চাই। আমার চোখ নিয়ে না বাবু ...।

রানি পঞ্চান্ন পর্যন্ত গুনেছিল, তারপর একদম চুপ হলে গেল। সাতবারের পর সে আয়নার নীচে থেকে নড়তে পারেনি। তার আগে ঘরের এদিক-ওদিক ছুটে বেড়িয়েছে। দরজার ছিটকিনিটা খোলার জন্য যখন ও ওপরে হাত বাড়িয়েছিল, তখনই শংকরলাল ওর হাতের ওপর প্রচন্ড কোপটা বসায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনটে আঙুল মাটিতে গিয়ে পড়ে। শংকরলাল ছুরির শেষ আঘাত হেনেছিল রানির বুকের ঠিক মাঝখানে। দুই রক্তাক্ত, সুডৌল গোল স্তনের সূর্যের মাঝখানে। তখন বুকের দুই বোঁটা দিয়েও রক্ত ঝরছে রানির। শংকরলাল দুই বোঁটাতে শিশুর মতন দু-টি চুম্বন দিল আর তারপর ছুরিটা নিজের বুকের ওপর শুইয়ে রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল রানির কোলে। আর এভাবেই বাকি রাতটা কেটে গেল ওর।

শংকরলাল ঘাড় ঘুরিয়ে বারান্দায় দাঁড়ানো মেয়েদের দিকে একবার তাকাল। হাঁ হয়ে ঝুলে পড়া অজস্র মুখ আর বিস্ফারিত গোল গোল চোখে চোখ পড়ল ওর। সকালের রোদ এখন সমস্ত বাড়িটাকে আক্রমণ করেছে, যা দেখা যায় তাই এত স্পষ্ট যে, সবটাকেই ছবি ছবি মনে হয়। আর যা কিছুকেই ছবি মনে হয় তারই সত্যতা যেন বেশ খানিকটা হ্রাস পায়। এরকম একটা আলো ঝলমলে চকচকে অসত্য সকাল বহুকাল আসেনি শংকরের জীবনে। ওর বাবারও মৃত্যু হয়েছিল শীতকালের এক অপরূপ রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে। যেদিন জীবনের সব অবাস্তবতা একত্র হয়েছিল একই সময়ে, একই স্থানে, অদৃশ্যভাবে। শংকরলালের ধারণা সেদিনও ওর জীবনে আলো ঝলমলে সকালবেলা একটা বিশেষ মাহাত্ম্য অর্জন করে, কালো মিশমিশে রাত্রির চেয়েও গভীরতর রহস্যময়তায়। তাই ইশকুলে বাংলা রচনার খাতায় ও লিখে বসেছিল,

একেকটা উজ্জ্বল সকালে মানুষ তার মৃত্যুর দিন অবধি সমস্ত ভবিষ্যৎকে পরিষ্কার দেখতে পায়। সে জাহাজের বন্দরে দাঁড়ালে দৃষ্টির বাইরের লুপ্ত জাহাজ ও নাবিক দেখতে পায়, দিগবলয়ের ওপরের জল আকাশ এবং ওপারের মহাকাশ দেখতে পায়, জাহাজ ডুবির নাবিকের মৃত্যু, জলপরির নৃত্য, গভীর মহাকাশে তারার সমাবেশ এবং সমস্ত শূন্যের পরপারে ঈশ্বরের প্রতিভা দেখতে পায়। এ সকালগুলো খুবই কম আসে এবং সাধারণত আসে না।

ওর এই রচনাটা হাতে নিয়ে বহুক্ষণ গুম মেরে বসেছিলেন ভবানী স্যার। তারপর ওকে টেবিলের কাছে ডেকে খুব নামানো স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, শংকরলাল, এসব কথার মানে কী? শংকরলালও তখন বুঝতে পারেনি কথাগুলোর মধ্যে দুর্বোধ্যতা কোথায়। শীতকাল নিয়ে রচনা লিখতে গেলে এরকম একটা প্রসঙ্গ তো আসতেই পারে। এ তো কোনো বানানো কথা নয়,

শংকর তা নিজে এসব স্পষ্ট দেখেছে। মাত্র একবার যদিও। বাবার হাত ধরে অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়েছিল খিদিরপুর ডকে, আর জাহাজের সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে যাচ্ছিল নিধুদা বিলেত যাবে বলে। দিদির সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছে নিধুদার, দেশে ফিরলেই বিয়ে। সে-বিয়ে কোনোদিন হয়নি, আর বিয়ের আগেই বাবা মারা গেলেন। নিধুদা অবসৃত হল শংকরের পরিবারের জীবন থেকে, কিন্তু মৃত্যু হয়েও বাবা থেকে গেলেন শংকরের মধ্যে। হারিয়ে যাওয়া গানের মতন। ভবানীবাবু অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি গল্প লেখ? শংকরলাল ঘাড় নেড়ে বলল, না। ভবানীবাবু বললেন, একটা লিখে দেখিয়ো আমাকে।

রানিকে শংকরলাল বলেছিল, তোমার জীবনী লিখে আমি আমার ইশকুলের স্যারকে পড়ে শোনাব। রানি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল, বলল, আমার জীবনী! আমাদের জীবনে কী আছে বাবু? আমরা তো লাথি খেয়ে বেঁচে থাকা মানুষ। আমাদের জীবন বলেই কি কিছু আছে?

শংকরলাল প্রশ্ন করেছিল, তোমার প্রেম নেই? রানি তখন নীরব হয়ে গিয়েছিল। তারপর বহু মুহূর্ত কেটে যাবার পর বলল, প্রেম তো দিয়েছি অনেক, বাবু। তার কিছুই তো ফেরত আসেনি। তাহলে আর প্রেম কী? তোমাকেও তো আমি ভালোবাসি, কিন্তু তুমি কাউকে ভালোবাসো না। তাহলে প্রেম কোথায়? শংকরলাল জিজ্ঞেস করল, কী করে প্রেম আসে রানি?

আমাদের কাছে প্রেম ফেরত আসার পথ নেই। কেউ টাকা দিয়ে ফেরত দেয়, কেউ ছুরি। দিয়ে। ছপ্পন ছুরি মেয়েটি প্রেম পেলে ছুরিতে। তুমি তো জানো।

তুমি কীভাবে ফেরত চাও রানি?

রানির মুখটা একবার খুশিতে আলো হয়ে উঠল, আর তার পরক্ষণেই ভয়ে, ঘৃণায় কালো হয়ে গেল। আবার কিছুটা খুশির ভাব হল মুখে আর তার পরে পরেই আরও ঘন কালো। খুব চাপা কন্ঠে সে বলল, যা পাওয়া যায় না তা চাওয়ার কী মানে?

শংকরলাল ওকে আশ্বস্ত করার জন্য কিছুটা আবেগের সঙ্গে বলল, না চাইতে জানলে কি সব পাওয়া যায় রানি?

–আমি যে প্রেম চাই তোমায় কে বলল?

–তোমার মুখের রং, তোমার চোখের তারা, তোমার গলার আওয়াজ।

—ওসব আমার কেউ নয় বাবু। ওরাই শুধু চায়, আমি চাই না। আমি যা চাই তা পেলে আমারই ক্ষতি।

-কেন?

আমি যে ছুরির প্রেম চাই। সবাই জানবে, সবাই কাঁদবে, ছপ্পন ছুরির মতন সকলে আমারও ইজ্জত করবে তা হলে। ওই ভালোবাসা তোমার নেই বাবু। হিংসা জিনিসটাই তো তোমার নেই।

আমি জানতাম না মেয়েটা ওইভাবে আমাকে বশ করতে চাইছিল কি না। আমি ভিতু লোক সেকথা সবাই জানে, আমার হাতে ছুরি দেখেও ও হেসেছিল বহুদিন। হেসেছিলাম আমিও আমার ছুরি ধরার আনাড়িপনা দেখে। আমার হাত থেকে তখন ছুরিটা কেড়ে নিয়ে আঙুলের নখের পাশে সেটিকে টিপে ধরেছিল রানি। আমি সঙ্গে সঙ্গে করো কী? করো কী করে ছুরিটা নিয়েছিলাম ওর থেকে। কিন্তু ততক্ষণে দু-ফোঁটা রক্ত পড়েছে সাদা চাদরে। রানি সেদিকে

তাকিয়ে বলেছিল, দেখো পাপের রক্ত কেমন হয়। আমি সেই রক্তের ফোঁটাতে আঙুল ঠেকিয়ে বলেছিলাম, সব মানুষের রক্তই এমন হয়। শুধু আমার গা কাটলে নীল রক্ত গড়াবে। দেখবে?

এই বলে ছুরি দিয়ে আমার পায়ের বুড়ো আঙুলে ঘসে দিলাম। মত করো অ্যাইসা! বলে চিৎকার করে উঠেছিল রানি। কিন্তু ততক্ষণে আমারও রক্তপাত শুরু হয়ে গেছে। নীল নয়, টকটকে লাল আলতার মতন রং। তাঁর সধবা জীবনে যেমন আলতা লেপে থাকত মা পদযুগলে।

বারান্দায় দাঁড়ানো সব মুখ ও চোখে এখন আমি সেই রং ছড়িয়ে যেতে দেখছি। অবাস্তবতার স্নিগ্ধ রং যেটা। আমি আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলাম, মুছে পাশে ঝেড়ে ফেললাম সেটা। ঘাম নয়, লাল জ্যান্ত রক্ত। রানির দেহের কিংবা আমার কপালের শিরা উপচে বেরিয়ে আসা রক্ত। সেটা ঝাড়তেই পাশের মেয়েটি ত্রাসের সঙ্গে সরে দাঁড়াল। রক্ত পড়ল বারন্দার গ্রিলের ছায়ায়। যে জায়গা এতকাল আমার পদধূলি পেরেই ধন্য হয়েছে। আমার একটু বাসনা হল পাশে কোথাও থুতু ফেলারও। কিন্তু সঙ্কোচ হল, পাছে থুতুর বদলে রক্ত পড়ে। আমি শুধু একটু কাশলাম। আমি বশিরের মাথায় হাত রেখে নম্র কণ্ঠে ডাকলাম, বশির, চল মুঝে পুলিশ স্টেশন লে চল।

বশির নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। শংকরলালবাবু ওকে পুলিশের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলছেন। ওঁর মতন শরিফ লোক এই কাজ করেছে? না, নিজের জান থাকতে বশির একথা বিশ্বাস করবে না। সাদা ধুতি পাঞ্জাবি-পরা এই ভদ্রলোকটি এ বাড়িতে ঢুকলে বাড়িটি আলো হয়ে যেত। পাশের বাড়ির দালাল আকবর মিঞা আর ২৫৮নং বাড়ির খাদু আর চঞ্চল বহু চেষ্টা করেছে লোকটিকে ফুসলিয়ে নিয়ে যেতে। পারেনি। রানির এই বাড়িকে শংকরলালবাবু বলতেন, হমারা ঘর। মদ বা খাবার আনিয়ে কখনো

খুচরো পয়সা ফেরত চাননি। দু-দুবার পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন বশিরকে। একবার রানির তবলচির অসুখ করলে নিজে তবলিয়া সেজে নাচের ঠেকা বাজিয়েছিলেন। পাছে খরিদ্দার ফিরে যায়। বোবা ফুলওয়ালা শুকদেওকে পুজোয় জামা আর পাজামা দিতেন। মাত্র তিন বছর এসেছেন এই মহল্লায়; কিন্তু ভাবটা যেন এ ওঁর নিজের বাড়ি। হোলির দিন সিদ্ধি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলে বাড়ির মেয়েরা ওঁকে কোলে করে তুলে এনে শুইয়ে দিয়েছিল রানির ফরাশে। আর একবার দুটো গানের রেকর্ড এনে বাজিয়ে বাজিয়ে গান তুলিয়েছিলেন তিনটি মেয়েকে দিয়ে। কতদিন কাগজ-কলম বার করে পাতার-পর পাতা লিখতেন আর বলতেন, বশির, এ হল তোদের ইতিহাস। একবার এক মন্ত্রী এ বাড়িতে এসে পর্দার বাইরে থেকে ওঁর মুখ দেখতে পেয়ে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিলেন। আর একবার কিছু বিলাতি লোক রানির কাছে এলে শংকরলালবাবু তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন একেবারে বিলাতি ঢঙে, বিলাতি ভাষায়, রানি বলত, ও হচ্ছে রাজা লোক। কোনো কোনো মেয়ে বলত, ‘দেওতা। আর এই লোকটাই এখন ওকে বলছে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য।

বশির পিছন ঘুরে শংকরলালের পা জাপটে ধরে কেঁদে উঠল, ইয়ে মত বোলিয়ে, ম্যায় গরিব হু, মগর হরামখোর তো নহি হুঁ। মত বলিয়ে অ্যাইসা বাবু! মর যাউঙ্গা। শংকরলালের পায়ের রক্ত এবার উঠে এল ওর হাতে। ও সরবে কাঁদতে কাঁদতে সেই রক্ত নিজের মুখে মাখতে লাগল। ওর ওই কান্না দেখে বারান্দার সব মেয়েরাও এবার একযোগে তারস্বরে কাঁদতে লাগল।

শংকরলালের আবছা আবছা মনে পড়তে লাগল রানির সেই কান্না যেদিন অজয় ওর গায়ে হাত তোলে। অজয়ই এনেছিল শংকরকে রানির কাছে প্রথম। শংকরের পা টলছিল, অজয়ের হাত ধরে কোনো মতে চৌকাঠ পেরিয়ে, পর্দা সরিয়ে ফরাশে এসে ধপাস করে শুয়ে পড়ল। রাত বেশ গভীর শরীরের

কোনো অঙ্গেরই এতটুকু জোর নেই। মনেও কোনো পিপাসা তেমনই নেই, শুধু ভয়। অজয় বলল, আমার বন্ধু তোমার সঙ্গে থাকবে আজ। রানি মুখ বেঁকিয়ে বলল। বলতে লজ্জা হল না তোমার? এই বললে সেদিন শাদি করবে, আর আজ একটা লোককে এনে বলছ, শোও এর সঙ্গে। তুমি কি মানুষ?

এই প্রচন্ড মত্ত অবস্থাতেও শংকর বুঝেছিল অজয় একটা ভয়ঙ্কর কান্ড করতে চলেছে। মেয়েটা ওকে ভালোবাসে, বিয়ে করতে চায়। আজ ওর প্রস্তাবে সে অপমানিত হয়েছে। কিন্তু অজয় ছাড়ার পাত্রই নয়। সে বলল, এ আমার প্রাণের বন্ধু, জিগরি দোস্ত। ওকে খুশি করলে আমি খুশি হব। রানি বলল, কেন, লতা তো আছে। গর্জে উঠল অজয় শাট আপ! আমার বন্ধু আমার প্রেমিকার সঙ্গে শোবে। যদি ‘না’ বল তো আজ শেষ ঢুকলাম এখানে। ফরাশে লটকে পড়ে থাকা শংকরলাল জড়ানো গলায় প্রতিবাদ তুলল, না, জয় না। আমি এর সঙ্গে থাকব। অন্য কাউকে ডাকো। রানি বলল, শুনলে? তোমার বন্ধু কী বলল? ওরও বিবেচনা আছে, যা তোমার নেই। আর তখনই, ঠিক তখনই অজয়ের ডান হাতের থাপ্পড় গিয়ে পড়ল রানির বাঁ-গালে। প্রথমে ব্যাপারটা বুঝে উঠতে বা বিশ্বাস করতে পারেনি রানি। তারপর একটু একটু করে ওর চোখ দুটো বড়ো হতে লাগল, চোখের কোল বেয়ে জল নামতে থাকল গালে। কিন্তু মুখ ফুটে একটা শব্দও উচ্চারিত হল না। চড় খাওয়া গালে বাঁ-হাতের তালুটা ঠেকিয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকল রানি। যে কান্নার আওয়াজ রাতের আকাশ ফুঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারে। অজয় বুঝে উঠতে পারল না কী করবে সে। নিজের হাতের তালুতে ঘুষি মারতে মারতে দুই লাফে ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। তার অক্ষম, মাতাল শরীরটাকে টেনে তুলে শংকরও বেরুতে গেল। কিন্তু চৌকাঠের মুখে হাত দিয়ে দোর আগলে দাঁড়িয়ে গেল রানি। নীচু গলায় বলল, বাবু, ঠেরিয়ে। আপ রহেঙ্গে ইহা ইস রাত।

কখন কোথায় আলো নিভল শংকর জানতে পারেনি। ওকে চিৎ করে কীভাবে ফরাশে শোয়ানো হয়েছিল তাও জানতে পারেনি সে। দেহের কোথাও কোনো উত্তেজনা নেই, শিহরন নেই, প্রয়াস নেই। ও ওইভাবে নিঃসাড় ঘুমিয়েছিল বহুক্ষণ। শেষরাতে ঘুমের প্রবল আস্তরণটা ঈষৎ সরে যেতে ও দেখল অন্ধকার ঘরে ওর অনাবৃত দেহের মধ্যবর্তী অঞ্চলে উপবিষ্ট আছে রানি। রানির চোখ বন্ধ, ঠোঁটে সামান্য হাসি, রানির দেহও অনাবৃত এবং ওর শরীর ছন্দে ছন্দে দুলছে শংকরের শরীরের ওপর। সমস্ত ঘটনাটিকে স্বপ্নের মতন ঠেকছিল শংকরের, কিন্তু শরীরের স্পন্দন, মোচড় আর বিস্ফোরণ ছিল পূর্ণ বাস্তব। শংকরের শরীর কাঁপছিল, ওর ঠোঁট কাঁপতে লাগল, ও কাঁপা কণ্ঠে ডাকল, রানি! আর তখনই শিকড় থেকে উপড়োনো গাছের মতন ওর ওপর ধসে নেমে এল রানির দেহ, আর রানির কণ্ঠ থেকে একটিই বিস্ফোরক ধ্বনি, ‘রাজা’!

শংকরলাল এবার আরেকটু স্পষ্ট করে দেখতে চাইল দূরে, দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে থাকা রানিকে। ওর মনে হল রানির খুব তৃপ্তি হয়েছে এই মৃত্যুতে। যেমনটি চেয়েছিল প্রায় তেমন তেমন। শংকরলাল অস্ফুট স্বরে ডাকল, রানি! ওর মনে হল রানি চাইলে এখনও সাড়া দিতে পারে। ওর এও মনে হল রানির ঠোঁটটা বুঝিবা একটু কেঁপে উঠল। কিছু বলতে চাইছে। রানি? কী বলবে ওকে রানি এখন? কী বলার আছে। সবই তো শেষ। শংকর দেখল, রানির শরীরটাও একটু কাঁপছে। কাঁপল কি সত্যি? শঙ্কর আবার অস্ফুষ্টভাবে ডাকল, রানি। আর ঠিক তখনই দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসা রানির শরীরটা সড়সড় করে ঢলে পড়ল ডান পাশে। আর ওর বাঁ স্তনের ঠিক নীচের তীব্র ক্ষতটা ভাস্বর হয়ে উঠল। পাঁজরভাঙা, প্রাণ-নিঙড়োনো ক্ষত। শংকরের আর দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করল না। ও সিঁড়ির দিকে মুখ ঘুরিয়ে হাঁটতে থাকল, মেয়েদের ভিড় ঠেলে ঠেলে। প্রতিটি মানুষকে ওর একেকটা দরজা মনে হল। দরজা পেরোনোর চেয়েও ওর কাছে কঠিন কাজ মনে হল এই মানুষ পেরিয়ে

পেরিয়ে যাওয়া। বাবা বলতেন, একটা দরজা পেরিয়ে বাইরে যাওয়া মানে এক সত্য থেকে আরেক সত্যে যাওয়া। অজয়ের সঙ্গে এই বাড়িতে প্রথম ঢুকেও ওর মনে হয়েছিল এক আলাদা বাস্তবে প্রবেশ করছে। সেই যে প্রথম দিন অজয় রাগ করে চলে গেল তারপর আর ফিরে আসেনি কখনো। কিছুদিন এপাড়ার অন্য এক মেয়ের ঘরে যাতায়াত শুরু করে এবং সবাইকে বলতে থাকে শংকরলাল ওর বান্ধবীকে কেড়ে নিয়েছে। কী প্রয়োজন ছিল ওর একথা রটানোর? শংকর সত্যিই তো কাউকে কেড়ে নেয়নি কারও কাছ থেকে। কারও কিছু কেড়ে নেওয়াতেই ওর বিশ্বাস নেই। কিছুকে ধরে রাখার জন্যও কোনো ব্যাকুলতা নেই ওর। রানিকে কি কখনো ও ধরে রাখতে চেয়েছে? চাইলে সেটা কি খুব সহজ ছিল না? অজয় কেন অমন করে ওর থেকে দূরে চলে গেল? রানির ঘরে সেই প্রথম রাতের পর একবারই অজয় এসেছিল ওর কাছে। ওর মাটিতে পড়ে যাওয়া টাকার পার্সটা ফেরত দিতে। বেশি কথা বলেনি, শুধু রাতের ঘটনার একটা বিবরণ চেয়েছিল। শংকর সত্যি ঘটনাটাই বিবৃত করেছিল বিনা কুন্ঠায়, বিনা ক্লেশে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে ধাপগুলোকে ওর সেই প্রথম দিনের মতন উঁচু উঁচু, বেয়াড়া বেয়াড়া ঠেকল। কিছুটা বিপজ্জনকও। ও খুব সন্তর্পণে, পাশের দেওয়ালে হাত রেখে রেখে নামতে লাগল সামনে নীচের দিকে তাকিয়ে। কপালের কিছুটা রক্ত ওর চশমার কাচে পড়ে দৃষ্টিটা ঘোলাটে করে দিল। কিন্তু শংকরলাল ওর চশমা পরিষ্কার করল না।

আমার শুধুই মনে হতে লাগল, আমি চশমা পরিষ্কার করব কেন? আমি তো খুব বেশি বেশি দেখছি এখন। ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান সবই এখন একযোগে আমার নাগালে। আমি যেদিকে খুশি যেতে পারি। রানি যখন আমার বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করত আমি বলতাম, দেখো আমার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এই যে বইটা লিখছি এটাই আমার ভবিষ্যৎ। প্রচন্ড উষ্মার সঙ্গে রানি বলত,

তোমার ওই ছাতার বই কবে লেখা শেষ হবে? আমি বলতাম, তোমার মৃত্যুতে। কারণ, এই বইয়ের নাম 'শেষ বাইজি'। তুমিই সেই শেষ বাইজি, তোমার সঙ্গে এই পাড়ার সব ইতিহাসের শেষ। রানি তখন প্রশ্ন তুলত, কে বলেছে তোমায় আমিই শেষ বাইজি? কত এসেছে এখানে আর কত আসবে। আমি নাচ-গান তো এখন আর করিই না, তাতে এই মহল্লার কিছু ক্ষতি হয়েছে? আমি বলতাম, তুমি না থাকলে আমার কাছে এই মহল্লাও আর থাকবে না। তখন একটাই আবদার থাকত ওর, তাহলে আমাকে খুন করে খেলা শেষ করে দাও।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে শংকরলালের মনে পড়ল আরও একদিনের ঘটনা। মদ ঢেলে দিতে দিতে হঠাৎ-ই রানি বলল, ২১২ নম্বরের আশিকী বাই যা স্বপ্নে দেখে তাই ঘটে। ও সেদিন আমায় বলল, তোর বাবু কি বই লেখে? আমি বললাম হ্যাঁ। একটা বই লিখছে এখন। তখন ও বলল, ওই বই লেখা হয়ে গেলে বাবু আর আসবে না তোর কাছে। শুনে ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল আমার। কিন্তু তারপরেই আশিকী বলল, কিন্তু তোর দুঃখ নেই রানি। তোকে খুদা উঠিয়ে নেবে। আর তখন কী আনন্দই না হল আমার। আমার তো আর বাঁচতে ইচ্ছেই হয় না। সবটাই কীরকম নাটক-নাটক লাগে। কোনো কিছুকেই আমায় আর সত্যি মনে হয় না।

খুব রাগ হয়েছিল শংকরের এই সব কথায়। খুব ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, কেন এই সব পাগল মেয়েছেলেদের কথা শুনতে যাও তুমি? ফের এই সব কথা তুলবে তো আমি এখানে আসা বন্ধ করে দেব। এই শেষের কথাটা উচ্চারণ করেই মনের ভেতর কোথায় যেন হোঁচট খেল শংকর! ওর মনে পড়ে গেল অজয়কে। অজয়কে মনে পড়ে গিয়েছিল রানিরও, কারণ ও জিজ্ঞেস করল, অজয়বাবুর সঙ্গে দেখা হয় তোমার? এর চেয়ে দুটো গালি দিলেও ভালো

করত রানি। ওই নামটাতেই কীরকম দগ্ধাচ্ছে শংকরের ভেতরটা। আজই সকালে ওর পান্ডুলিপি জমা দিয়েছে ও প্রকাশকের ঘরে। যারা ওই দু-হাজার পাতার দীর্ঘ পান্ডুলিপি পড়েছে তারা সবাই একমত যে ওরকম গম্ভীর, বাস্তব, দার্শনিকতাসম্পন্ন বই বাংলায় লেখা হয়নি কোনোদিন। কেউ কেউ বলল, এ বই খুব বড়ো পুরস্কার পাবে। কেউ বলল, এই বই বাংলা সাহিত্যে একটা রত্ন হয়ে থাকবে। মিতবাক প্রকাশক মহাশয় শুধু বললেন, এই বই কাকে উৎসর্গ করবেন শংকরবাবু? শংকর বহুক্ষণ নীরব থেকেছিল তখন। তারপর খুব আস্তে আস্তে বলল, অজয় চৌধুরীকে। প্রকাশক কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়ে বললেন, তিনি কে? এ নাম তো কখনো শুনেছি বলে মনে হয় না আপনার কাছে। শংকর ফের খুব ধীর কণ্ঠে, প্রায় অন্যমনস্কভাবে বলল, সে আমার বন্ধু।

আমি ফের বউবাজারের সেই গলিটায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমার খুব তৃপ্তি হয়েছে আজ দুটো কাজ প্রায় নিখুতভাবে সম্পন্ন হওয়ায়। শেষ বাইজি’ বইটা যেভাবে যেখানে শেষ করতে চেয়েছিলাম তা পেরেছি। নায়িকার মৃত্যু দিয়ে একটা গোটা সমাজের ইতিহাসের ইতি টেনেছি। সেই নায়িকাকেও প্রায় বইয়ে বর্ণিত ধারায় খুনও করেছি। আমি ছাড়া কারও পক্ষে এখন বলা মুশকিল ওই হত্যাটা আগে, না ওই বর্ণনাটা। আমি চেয়েছিলাম ঘটনাকে কল্পনার কাছাকাছি টেনে আনতে। কিন্তু রচনাকালে হত্যার দিনক্ষণ ও কারণের কোনো হদিশ পাইনি আমি, আমার গোটা বইয়ে গোঁজামিল শুধু ওইটুকুই। তা আমার স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। আমার জীবনে এই রানি ও তার এই সমাজকে যে তুলে এনেছিল সেই আমার প্রিয় বন্ধু অজয়ই ফের, প্রায় দৈবযোগে, ঘটনাটিকে সত্য করে তুলতে সাহায্য করল। কীভাবে ধন্যবাদ জানাব ওকে আমি?

টলতে টলতে শংকরলাল এবার গলির রাস্তা ধরে এগোতে থাকল ট্রাম রাস্তার দিকে। ওর ক্ষেপ নেই রাস্তার লোক ওকে দেখে কী ভাবছে, কী করছে। রাস্তার

পাশে থাকা এক ঠেলাওয়ালা বলে উঠল, ইয়ে বাবু কাঁহাসে হোলি খেলকে আঁয়ে? ঝুল বারান্দায় দাঁড়ানো এক আগ্রাউলি বউ মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে উঠল, হে রাম! ইনকো কোই ছোরি মারা হোগা! এক বাঙালি প্রাতভ্রমণকারী কিছুটা প্রাকুটি হেনে বললেন, যত্তো সব রাবিশ!

শংকর শুধু আপন মনে স্মরণ করছিল অজয়কে। এ পাড়ায় প্রথম দিন ওকে সঙ্গে করে আনতে আনতে বলেছিল, যত যাই করো বাপু এসব মাগির সঙ্গে পিরিত কোরো না। আর যতই সোহাগ জাগুক প্রোটেকশান না নিয়ে কাজকর্ম কোরো না। রোগের ডিপো এককেটা সব। এইটা শুধু মনে রাখবে ডিয়ার ফ্রেণ্ড। এসব কথা বলছি কারণ পৃথিবীর সকলের চেয়ে আমি তোমায় বেশি ভালোবাসি। এ ভালোবাসা কোথাও পাবে না গুরু!

পৃথিবীর সব কিছুর চেয়েও হয়তো শংকরকে বেশি ভালোবাসত অজয়। লেখাপড়া বা অন্য কোনো ক্ষেত্রেই কোনো কৃতিত্ব অর্জন করেনি অজয়। কিন্তু শংকরের উত্তরোত্তর খ্যাতি ও শ্রীবৃদ্ধিতে নিজের পূর্ণতা দেখতে পেত ও শংকরের জীবনের প্রথম বই বেরুনোর পর নিজের পয়সায় মদের পার্টি বসিয়েছিল। বিধ্বস্ত ধনী পরিবারের সন্তান অজয় টাকা আয়ের চেয়ে বেশি ভালো চিনত টাকা ব্যয়ের পথটা। নিজের পয়সায় শংকরের দশ কপি বই কিনে একে-তাকে বিতরণ করেছিল। আর সকলকেই দিয়েছিল একই পরামর্শ, পড়ো আর মানুষ। হও। বলো, কেউ পারে এমন লিখতে আমাদের শংকর ছাড়া? খুব বেশি লোক যখন ওর এই উচ্ছাসের ভাগিদার হয়নি ও হতাশার সুরে বলেছিল, গুরু, তুমি আজকের লেখক নও। বহু এগিয়ে আজ এসব মালের থেকে। সঠিক পাঠক পেতে বহুদিন অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে।

এই অজয়ের একটা অভিলাস ছিল শংকরের কৌমার্য হরণ করাবে কোনো মেয়ে লাগিয়ে। বলত, করে দ্যাখ মাইরি, সত্যি দারুণ ব্যাপার। তুই নিজেই

এসে তারপর আমার কাছে। কবুল করবি। শরীর থেকে আগুন ঝরে গেলে তুই ঠাণ্ডা মাথায় আরও ভালো লিখবি। শংকর 'দুর! দুর' করে কাটিয়ে দিয়েছে ওকে। অথচ প্রথম যেদিন পারল ওকে রানির ঠেকে আনতে সেদিন থেকেই ওদের বন্ধুত্বের ইতি। অজয়ের হয়তো রাগ হয়েছিল, শংকরের অভিমান। দু জনের কেউই তাদের নিজের নিজের মনকে সঠিক জানে না, তাই কেন যে তারা আর একে অন্যের সামনে দাঁড়াতে পারল না সে-রহস্য রয়েই গেল।

শংকরলাল আচমকা ওর পেছনে ফেলে আসা গলির দিকে ফিরে চাইতে চমকে উঠল। এইমাত্র যে নিরিবিলি গলিটা ও পার হয়ে এসেছে সেখানে লোকে লোকারণ্য। এত লোক যে কোথায় থাকে কেউ জানে না। এত অল্প উত্তেজনাতেও ওরা যে কী করে এত শোরগোল বাধায় তাও শংকরের অজানা। তিন তিনটে বছর এই লোকের মধ্যে মিশে, এদের সুখ-দুঃখ পর্যবেক্ষণ করে এদের নিয়ে মস্ত কেতাব লিখেও শংকর ওদের সত্যিকার চরিত্রের কোনো হদিশ পায়নি। প্রায়ই ওদের দেখে ওর মনে হয়েছে ওদের মধ্যে কোনো প্রাণ নেই শুধু রক্তপ্রবাহ আছে ধমনীতে। ওরা আসলে সবাই মৃত, কোনো জাদুবলে চলে-ফিরে বেড়ায়। ওদের জীবনের একটা জাদু টাকা, অপরটা মৃত্যু। কোনো মৃত্যু ঘটলে এই মৃতেরা কীভবেই যেন সচল, জ্যান্ত হয়ে ওঠে। শংকর দেখল ওই অমানুষিক জনারণ্য থেকে উন্মাদের মতন ঠেলে বেরিয়ে আসছে বশির। বশির বড়ো ভালোবাসে শংকরলালবাবুকে। ও দৌড়ে এসে শংকরকে জাপটে ধরে কানের কাছে মিনতির সুরে বলল, বাবু, তুমি পালিয়ে যাও। ওই শুয়োরের বাচ্চারা তোমায় খুন করবে। আমার মাথার দিব্যি, থানায় যেয়ো না। পুলিশ তোমায় ফাঁসি দেবে। তাহলে রানি কোনোদিনই শান্তি পাবে না বাবু। বাবু, তুমি পালাও। তুমি এদেশ ছেড়ে চলে যাও।

শংকরলালবাবুর গাটা ধরে বশির বুঝল খুব জ্বর এসেছে লোকটার। ধড়াস ধড়াস করে ডাক ছাড়ছে বুকটা। গায়ে রক্তের গন্ধ। চোখ দুটো সাধু ফকিরদের মতন শান্ত, ঘুমিয়ে পড়া। এত সুন্দর একটা মানুষের এই দুর্দশা বশির জীবনে দেখেনি। রানি বলত, বাবুর গা দিয়ে আলো বেরোয়। কথাটা মিথ্যে নয়। বাবুর রক্তমাখা শরীর থেকে এখন আলো ঠিকরোচ্ছে। যেন অন্য জগতের লোক এই বাবু। বশির মাটিতে বসে বাবুর পা ছুঁল ফের। ভীষণ ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে বাবুকে এখন, যেন নিষ্পাপ শিশু। বাবুর হাঁটুতে মুখ ঘষল, তারপর লুঙির কোঁচড় থেকে বাঁকানো ছোরা বার করে ভান করল যেন পেটে কোপ মারবে। আর বলতে থাকল, বাবু তোমায় মারব বলে শুনিয়ে এসেছি আমি। আমার ঘরের মেয়ের জন্য প্রতিশোধ নেওয়ার ভার আমার। কিন্তু আমি তোমায় মারব না। তুমি পালাও, ওরা দেখুক আমি মারতে চেষ্টা করছি।

মানুষের ভিড় এবার এগিয়ে আসছে সামনে। প্রচন্ড আওয়াজ সর্বত্র। শংকর এক লাথিতে বশিরকে মাটিতে ছিটকে ফেলে ট্রাম রাস্তা ধরে দৌড় লাগাল থানার দিকে। বেইজ্জত এড়াবার একটিমাত্র জায়গা এখন ওইটা। শরীর বইছে না,মাথা পাক দিচ্ছে, কিন্তু ভীষণই সুখী সুখী লাগছে শংকরের। রানির মৃত্যুর অংশ লেখার সময় যে সুখ সে পেয়েছিল। সব কিছু হারিয়ে ফেলার সুখ।

আমি একটু একটু আভাস পাচ্ছিলাম রানি অন্য পুরুষের দিকে চলছে। ও আমাকে জব্দ করতে চায়। ওর ধারণা আমাকে রাগিয়ে তুললে আমি ওকে পাওয়ার চেষ্টা করব। কারণ এমনিতে পেলে আমার নেবার বাসনা নাকি মিটে যায়। কিছুদিন যাবৎ প্রায়ই বলছিল, আপনা-আপনি পেলে তো আমাকে। তাই কদর বুঝলে না। তোমরা বলো আমাদের বিবেক, ভালোবাসা নেই। সেটা নেই দেখছি তোমাদের। তোমাদের সব ভালোবাসা কোমরের তলায়। ও আমি জানি।

যে তিনটে ছুরি শংকরলাল এনে ও বাড়ির মেয়েদের দেখিয়েছিল। তার মধ্যে কসাইয়ের চাকুটাই রানির মনে ধরেছিল খুব। ইদানীং অকারণে দেয়ালে আঁকিবুকি কাটত। চ্যাঁচড়, চ্যাঁচড়! আওয়াজটা কান ভেদ করে মস্তিষ্কে গিয়ে চড়ত। ও থামাতে বললে রানিও ফুঁসে উঠত, বেশ করব। আমার ছুরি, আমার ঘর। তুমি তোমার বাড়িতে গিয়ে ধ্যান করো যাও। তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই আর। শংকর ওর 'শেষ বাইজি' থেকে পড়ে শোনানোর কথা তুলল যখন তখন রানি বলল, তোমাদের ওসব বাংলা আমি বুঝি না। সাহস থাকলে শরিফ মেয়ে কাউকে বিয়ে করে তাকেই পড়ে শুনিয়ো। সত্যি কথা লেখার হিম্মত কোনোদিন তোমার হবে না। পারবে লিখতে কীভাবে দিনের পর দিন বিলকুল বেহুশ মাতাল হয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে বিছানায় আর আমাকে তোমার ওপরে চড়ে কাজ করতে হত? পারবে লিখতে আমার দু-বার পেট খালাস করতে হয়েছে? পারবে লিখতে আমি বাইজি নই, বেশ্যা? পারবে লিখতে আমি অজয়ের প্রেমিকা, আর তুমি কাবাবমে হাড্ডি? তুমি আমাদের কথা কী লিখবে, তুমি তো নিজের বাইরে কিছু জানো না, দেখো না? এক তোড়ে এত সব কথা বলে রানি ফের ছুরি দিয়ে দেয়ালে কাটাকাটি খেলায় মন দিত। শংকর মনে মনে ভাবত রানি যা যা বলে গেল ও নিজে কখনো চাইবে না শংকর তা লিখুক। খুব ভালো লেখা বলতে রানি বোঝে খুব বিশুদ্ধ রোমান্টিক প্রেমের কাহিনি, যেমন লেখেন গুলশন নন্দা। গুলশন রানির প্রিয় লেখক, শংকরলালের পরেই। একজনের সব লেখাই তার পড়া, অন্য জনের একটি বর্ণও সে পড়েনি কখনো কারণ বাংলা হরফও সে চেনে না। ওর বই শুধু যত্ন করে আলমারিতে তুলে রেখেছে সে।

যে ছুরিটা রানির জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল সেটি ছাড়া বাকি দুটো এখন আমার পাঞ্জাবির পকেটে। যে কারণে দু-ধারের দুই পকেট বিশ্রীরকম ঝুলে আছে। কেনা অব্দি এ দুটির কোনো ব্যবহার কখনো হয়নি। আমার ইচ্ছে ছিল ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তিনটেকেই ব্যবহার করব। কিন্তু কসাইয়ের ছুরিটা হাতে

উঠে প্রথমবার রক্তপান করার পর, আর নামতেই চাইল না। আমার এখন মনে হচ্ছে কেবল প্রথম আঘাতটাই হেনেছিল আমার ডান হাত। বাকি চুয়ান্ন কোপ ছুরিটা নিজের থেকেই চালিয়েছে। হাত শুধু তাকে ধরেছিল। রক্তপান করলে ছুরিও জীবন পায়, অধিকতর রক্তপাতের অধিকার পায়। আমার এখন মনে হচ্ছে বেচারি শংকর ওই ছুরিটা কিনেই যাবতীয় সর্বনাশ ঘটিয়েছিল। শংকরের মগজে খুন থাকলেও হাতে কখনোই খুন ছিল না, একথা আমার চেয়ে বেশি কেউ জানবে না। ওই তো আমি দেখতে পাচ্ছি বিভ্রান্তের মতন লম্বা লম্বা পায়ে শংকরলাল আমার পিছু নিয়েছে। আমাকে ছাড়া ওর কোনো গত্যন্তর নেই, কোনো রেহাই নেই। ও যদি বাঁচতে চায়—আমি জানি ও বাঁচতে ভালোবাসে— ওকে এই আমার পথেই আসতে হবে। আমি সুযোগ বুঝে পাশের এক গলিতে ঢুকলাম। শংকরও ঢুকল, অলিগলি সবই মুখস্থ শংকরের। বড়ো রাস্তার ভিড়ের চেয়ে গলির নির্জনতাই ওর পছন্দ। চোখে কম দেখে শংকর, বড়োসড়ো বস্তু হলেও পুরো চেহারার হদিশ পায় না। শংকর ভালোবাসে বস্তুর ডিটেল, ডিটেলের ভাঁজ। ও যখন কারও মুখের দিকে তাকায় ও মুখের রেখা, রেখার গতিপ্রকৃতি, রেখার গভীরতা, বয়স, তার সংলগ্ন দীর্ঘশ্বাসও দেখতে পায়। মুখের নীচের শিরা, শিরার ভেতর রক্ত, রক্তের ভেতর শ্বেত ও লোহিত কণিকা, রক্তের মধ্যে শংকর দেখেছিল ভালোবাসা নয়, ঘৃণা। বিশেষ কাউকে ঘৃণা করার ঘৃণা নয়, নিজের রক্তকে ঘৃণা। মরার জন্য যে রক্ত কণিকাগুলো দিবারাত্র ছটফট করত। শংকর না মারলে রানি নিজেই খুব শিগগির আত্মঘাতী হত।

রানি কসাইয়ের ছুরিটা আলনার পেছনে সরিয়ে রাখতে রাখতে শংকরকে বলেছিল, এই রইল তোমার ছুরি। পরে বোলো না আমি লুকিয়ে রেখেছি। তারপর সেজেগুঁজে হন হন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শংকর বলল, কোথায় যাচ্ছ?

—সে খোঁজে তোমার কী দরকার?

–যদি আসতে চাই?

—নিতে পারব না। অন্য বাবু আছে।

—কে তিনি?

—যে কেউ! পয়সা দেবে এমন যে কেউ। রানি বেরিয়ে যেতে শংকর উঠে কিছু দূর অবধি ওর পিছু নিল। তারপর সড়াৎ করে একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসল রানি। ট্যাক্সি ওর জন্য দাঁড় করানোই ছিল। ট্যাক্সি রাস্তার থেকে বাঁক নিয়ে ফের চলতে শুরু করলে শংকর এক ঝলক দেখতে পেল রানি আর অজয়ের স্পষ্ট আত্মমুগ্ধ দুটো মুখ।

একটা অজানা, নামগোত্রহীন ব্যথা চাগিয়ে উঠল শংকরের বুকে। সেই সঙ্গে একটা তৃপ্তিও আনন্দও। ওর তিন বছরের সাধনার ধন ‘শেষ বাইজি’ বইটা সার্থক হয়েছে বলে মনে হল ওর। ওর হাত ঘামতে লাগল, ওর গলায় মদের পিপাসা লাগল। শংকরও একটা ট্যাক্সি ধরে বাড়ি এল ঘেমো জামা বদলানোর জন্য। গায়ে দামি বিলিতি আফটার শেভ ছড়াল, আয়নায় একবার নিজের মুখটা দেখলে তারপর বেশ অন্যমনস্কভাবে দেরাজ থেকে তুলে নিল যত্ন করে রাখা দুটো ছুরি। ছুরি দুটো পকেটে রাখার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ একটা বিষাদ ছড়িয়ে পড়ল ওর ভেতরে। এই মুহূর্ত থেকে আর যা যা ঘটার আছে ওর জীবনে সবই ওর জানা, খুবই চেনা। যেমনটি যেমনটি লেখা হয়েছে ঠিক তেমন-তেমন করে ঘটনার শেষ করতে পারলে ওর তৃপ্তি হয়। আচমকা ওর মনে পড়ল বইতে রক্তচুনি আংটিটি মধ্যমায় নয়, অনামিকায়। ও সঙ্গে সঙ্গে আংটিটা খুলে যথাস্থানে পরাল। তারপর আরও মনে পড়ল বইতে ওর পায়ে কোলাপুরি চপ্পল, স্যামসন জুতো নয়। জুতো খুলে কোলাপুরি পরল ও।

তারপর আরও মনে পড়ল ওর আফটার শেভ ‘শ্যানেল নাম্বার ফাইভ’ নয় ‘খ্রিস্তিয় দিওর। ফের একবার গালে স্প্রে করল নতুন গন্ধটা। ওর পকেটে দু-শো টাকা থাকার কথা। অতএব আরও এক-শো টাকা দেরাজ থেকে বার করল ও। এবং শেষমেষ চেনা বইটি, বইয়ে বর্ণিত ঘটনা অনুযায়ী মা, বাবা, কাকার ছবিতে প্রণাম করল। এবং খুব মৃদুস্বরে আওড়াল ওর প্রিয় কবি এলিয়টের পঙক্তি—দিস ইজ দ্য ওয়ে দ্য ওয়র্লড এনডজ, দিস ইস দ্য ওয়ে দ্য ওয়র্লড এনডজ/ নট উইথ এ ব্যাং বাট আ হুইমপর।

এই মুহূর্তে শংকর আমার পিছন পিছন আসছে। ঠিক এভাবেই ও কাল ট্যাক্সি নিয়ে ঘুরছিল রানির খোঁজে। এ বাড়ি। ও বাড়ি। এ হোটেল, ও হোটেল গঙ্গার ধার। তারপর একসময় ওর প্রিয় হুইস্কি নিয়ে এসে বসল রানির শোবার ঘরে। যে-ঘর গত তিন বছর শংকরেরও ঘর। খুব একলা বোধ করছিল ও, মাঝে-মধ্যেই কান্নায় ধরে আসছিল গলা। রাগিণী এসে ওর পাশে বসে জানকীর গল্প করতে চাইল, কিন্তু মন ভরল না শংকরের। পাশের বাড়ির থেকে দমাদ্দম ঢোলের আওয়াজ আর কাস্টমারের উল্লাস ভেসে আসছিল। রাগিণী একটা গান গাইবে ভাবছিল, কিন্তু শংকরলালবাবুর মন খুব উদাস ঠেকল। ও তখন কারণটা আঁচ করে বলল, জানো তো রানির আজ জন্মদিন। ও তাই বাইরে যাবে বলেছে। তোমার জন্যে খাবার আনিয়ে দেব? শংকর মাথা নেড়ে জানাল, না। তখনই বাইরে খদ্দেরের আওয়াজ পেয়ে রাগিণী উঠে গেল আর শংকরও কী ভেবেই জানি উঠে গিয়ে আলনার পিছন থেকে তুলে নিল কসাইয়ের ছুরিটা। তারপর জায়গায় ফিরে এসে রানির মতন চ্যাঁচড়-চ্যাঁচড় শব্দ করে দেয়ালে লিখল ‘শেষ বাইজি’। আবছা শুনতে পেল দর নিয়ে বচসা করে খদ্দের চলে যাচ্ছে। আর তখনই সিঁড়ির মুখ থেকে রানির গলা, বৈঠিয়ে সাহাবলোগ। চল কিউ যাতে? পৈসা কম হ্যায় তো বাদমে দিজিয়েগা। উসমে কা হ্যায়? রানিকে খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছে। কিছুটা স্বাধীন হওয়ার

আনন্দ। আমি বললাম, তবলচি ডেকো না, আমি আজ তবলা বাজাব। বহুদিনের অনভ্যস্ত হাতে ঠেকাটা প্রথম জমছিল না। রানির নাচও দেহ ছেড়ে যায় যায়। খদ্দেররা বেশ বিরক্ত হচ্ছে মনে হল। একটু পরে নেশা চড়তে গান-বাজনা গৌণ হয়ে পড়ল। তিনজন খদ্দেরই ঘুরে-ফিরে রানিকে ছুঁতে চাইছে, ধরতে চাইছে, চুমু খেতে চাইছে। রানি ওদের থেকে সটকে সটকে যাচ্ছে বটে, কিন্তু আমার কাছে আসবে না। এবার ওরা টাকা ছোড়া শুরু করল, একজন লাফ দিয়ে রানির বুকে হাত রাখল, হাতটা ব্লাউজের ভেতর ঢোকাবার চেষ্টা করল। হাত নিশপিশ করছিল আমারও। বহুদিন রানির বুক স্পর্শ করিনি। কিন্তু রানি এখন স্বাধীন, ওকে চাইবার অধিকার আমার কম। তবু আমি তবলা থামিয়ে রানির পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম, ওর বুকে হাত রাখার প্রয়াস করলাম, ওর ঠোঁটের কাছে ঠোঁট নিয়ে জিরাফের মতন লজ্জাহীনভাবে নিজেকে সঁপে দিলাম।

আর তখন, ঠিক রানির সর্বশক্তির চড় এসে পড়ল শংকরের গালে। তারপর ফের এক চড়। একজন খদ্দের উঠে একটা রদ্দা মারল শংকরের পিঠে; শংকর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। প্রকান্ড আয়নাটার ওপর। আর আয়নার ভেতর থেকেই দেখল রানি আলনার পিছনে কসাইয়ের ছুরিটা খুঁজছে পাগলের মতন। পকেট থেকে সেটি বার করে শংকর ছুড়ে দিল রানির হাতে। আর রানি সেটা লুফে নিয়ে তেড়ে গেল সেই খদ্দেরের দিকে যে হাত উঠিয়েছে শংকরের গায়ে। বাপরে! বাপরে!' করে খদ্দের তিনটি কয়েক লাফে ঘর ছেড়ে পালাল। হার্মোনিয়ামের মেহফুজ আর সারেঙ্গির রশিদ আলিও কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতন মানে মানে উঠে গেল। একটা আসরের বারোটা টাকা ওদের পন্ড হল। তারপর রানি ফিরে এসে মাটিতে ঝুঁকে বসা শংকরের পিঠে হাত রেখে বলল, যাও শুতে যাও। আমারও ঘুম পাচ্ছে। রানি ছুরিটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বলল, আরেকটু হলে আজ এতে খুন লাগত, বাবু।

আমি কিন্তু দেখলাম ওতে রক্ত লেগেই আছে। বাঁট অবধি। যেভাবে বর্ণনা আমার বইতে। বললাম, খুন যা লাগার ওতে লেগেই আছে। আরও কাছে এসো, দেখাতে পারব! একটু দুষ্টুমির হাসি হেসে রানি বলল, খুন তোমার মনে, তোমার চোখে। তোমার হাতে কোনো খুন নেই, তোমার হাত কখনো আমার বুক অব্দি উঠবে না। এই দেখো আমার বুক, কী গরম! হাত দাও তাহলে বুঝবে। দাও, হাত দাও। একটু ভালোবাসো আমাকে প্লিজ, আজ আমার জন্মদিন।

হ্যাঁ, সেই মুহূর্তে শংকরের হাত রানির বুকে বসল। কিন্তু হাতের সঙ্গে সঙ্গে ছুরিটাও উঠে গিয়েছিল। হতের সঙ্গে সঙ্গেই বহুদূর নেমে গেল সেটাও রানির বুকে। ওঃ বাবু! বলে বুকে হাত চাপা দিয়ে রানি শংকরকে ধাক্কা দিয়ে সরে গেল দূরে। গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এসে লাল করে দিয়েছে ওর সাদা শিফনের শাড়ি। আঘাতের জায়গাটায় দু-হাত চেপে ধরে রানি গোঙাতে লাগল। তুমি সত্যি সত্যি মারলে আমাকে বাবু? তুমি আমায় মারলে? ততক্ষণে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে শংকরলাল আর ছুরিটা ওর ডান হাতটা চিরকালের মতন উন্মাদ করে দিয়েছে।

প্রথম আঘাতটাই ছিল শংকরের অভিপ্রেত, বাকি চুয়ান্নটি লজ্জা ও পাপবোধ থেকে ছুরির নিজস্ব হঠকারিতা থেকে। তা ছাড়া কিছু কিছু মানুষ ছুরি খেপায়, যেমন রানি। একটা ছুরি আসলে মুক্ত বিহঙ্গের মতন, শুধু অপেক্ষায় থাকে উড়বার। উড়তে উড়তেই থাকে, কখনো শরীরে বসে কখনো আসবাবে। উপরন্তু এ ছুরির কোনো নীড়, কোনো খাপও ছিল না। এ শুধু নিজেকে ফিরিয়ে নিচ্ছিল শংকরের হাতে। তাই বেশ কবার শংকরের মুঠো আলগা হওয়া সত্ত্বেও ছুরি পড়ে যায়নি, নিজের কাজ করে গেছে। রানি কোপগুলো গুনছিল দেখে কিছুটা নেশা হয়েছিল শংকরেরও। অন্তত ছাপ্পান্ন ঘা মারার বাসনা জেগেছিল ওরও। কিন্তু পঞ্চান্ন বারের পর রানির চোখ দুটো

ছাড়া জায়গা ছিল না। চোখ খারাপ শংকরের, তাই পৃথিবীর সমস্ত মানুষের চোখের জন্য ওর বড়ো মায়া। আর রানি চেয়েছিল চোখ দুটি যেন বেঁচে থাকে। শংকর রানির কোলে শুয়ে পড়লে চোখ দুটো এক দৃষ্টে ওকে দেখে গেল, পাহারা দিল। পাশের ঘরের মানুষও একটা আওয়াজ পেল না। রক্তের গন্ধ পেল না। বহুদিন আগে দিদির হাত ধরে যেমন নীরবে রানি এসেছিল এখানে প্রায় তেমনই নীরবে চলে গেল শংকরলালকে কোলে শুইয়ে।

আমি আর দূরত্ব রাখতে পারছি না শংকরের সঙ্গে। লোকের হাতে অপদস্থ হওয়ার চেয়ে থানায় আত্মসমর্পণ শঙ্করের কাছে ঢের সম্মানজনক। কেউ ওকে আঘাত করলে ও লজ্জায় মরে যাবে। অপমান ওর কাছে খুব শোচনীয় জিনিস। ছেলেবেলায় একবার ও পাবলিকের হাতে পকেটমারের মার দেখে কেঁদে উঠেছিল। কেঁদেছিল এইজন্য নয় যে, লোকের মারে পকেটমারের লাগবে, কেঁদেছিল ওই মারের চোটে পকেটমারটি হয়তো কেঁদেই ফেলবে। একটা পুরুষমানুষ কাঁদলে ওর মনে হত কিছু একটা অন্যায় ঘটছে, কোথাও। কারণ পুরুষমানুষের তো কাঁদার কথা নয়। শংকর সেই থেকে পুরুষের কান্না সম্পর্কে খুব সচেতন, যদিও নিভৃতে কখনো কখনো নিজেও কেঁদেছে। সাধারণত নিজের জন্য নয়, অন্যের দুঃখ কিংবা অপমানে। এই মুহূর্তে জনতার দ্বারা আক্রান্ত হলেও ভেতরে ভেতরে মরে যেত ওর এই ভাবমূর্তিটির জন্য। নিজেরই অজ্ঞাতে অথচ কিছুটা নিজেরই চেষ্টায় যে ভাবমূর্তিটি ও গড়ে তুলেছে নিজের জন্য। সহৃদয়, মানবিক, উন্নত, নিঃসঙ্গ, অভিমানী।

শংকর ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়াল থানার সদর দরজায়। একটা চিনে বাদামওলা ছলছল চোখে বসে আছে সেখানে, হয়তো জরিমানা মকুব করাতে এসেছে। দরজায় কোনো সেপাই নেই, কোনো আগন্তুকও নেই। থানার পক্ষে দিনটা এখনও শুরুই হয়নি কোনোভাবে। শংকরের খুব হাঁপ ধরেছে এই লম্বা ছুট লাগিয়ে। ও দরজা পেরিয়ে ঢোকার আগে দেওয়ালে হাত ঠেকিয়ে দাঁড়াল

আর বুকের শ্বাস ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করল। আর ওর কানে এল বেশ খানিকটা চেঁচামেচি সামনের ঘরটার থেকে। এক বাঙাল কনস্টেবলই হয়তো আরেকজনকে বলছে, আরে দেখেন দিকি এই মাগিটার ব্যাপার-স্যাপার! সক্কাল থিকা আইয়া কয় হপন দেখসি, হপন দেখসি। তা হপন দ্যাখসো তো আমার কী করার আছে? অন্য কনস্টেবলটি এবার বলল, কী এমন স্বপ্ন দেখেচে বিবি? যে একেবারে সক্কালবেলা থানায় এসে ঢুকল? থানায় কি গণকার থাকে? এবার শংকর শুনতে পেল একটা অবাঙালি মহিলার কন্ঠস্বর। না বাবু, আমি বলছি তুমি আমার সঙ্গে এসো। আমি যা স্বপ্ন দেখি তা ঘটে, আমার নাম আশিকী বাই। আমি সাফ সাফ দেখলাম এক বাঙালিবাবু চাকু দিয়ে আমাদের একশো পাঁচ নম্বরের রানিকে টুকরো টুকরো করছে। ওই স্বপ্ন দেখার পরই আমি এই থানার দরজায় এসে বসে আছি। তুমরা কেউ না গেলে আমি কিছুতেই ফিরে যাব না। শংকরের ঝিম ধরছিল মাথায়, দেয়াল থেকে ওর হাত সরে আসছে, পা দুটো ভেঙে মাটিতে শুয়ে পড়তে চাইছে, কিন্তু মন চাইছে আশিকীর সমস্ত বিবরণটা শোনে। শংকর শুনল আশিকী ওর বর্ণনা দিচ্ছে হুবহু। যেন ছবির বর্ণনা। বলছে, মানুষটা লম্বা, ফর্সা, রক্তেভেজা পাঞ্জাবি-পাজামা পরা। চোখে চশমা, মুখে ও হাতে রক্ত, চোখের পাতায় রক্ত, কিন্তু ঠোঁটে সামান্য, প্রায় অদৃশ্য হাসি। লোকটা শরিফ।

বর্ণনা শেষ হতেই শংকর ধীর পায়ে দরজার চৌকাঠে গিয়ে দাঁড়াল। ঘরের ভেতর থেকে দরজার চৌকোনো ফ্রেমের মধ্যে ওকে একটা বীভৎস তৈলচিত্রের মতন দেখাল। দুই কনস্টেবল ও আশিকী বাই একই সঙ্গে একটা আর্তনাদ গোছের ধ্বনি করল, যেন ভূত দেখছে। শংকর কোনো মতে দু-টি শব্দ উচ্চারণ করতে পারল, আমাকে ধরুন। তারপর শিকড়ছেঁড়া বটের মতন মুখ থুবড়ে পড়ল ঘরের মেঝেতে।

শংকর পড়লে আমিও পড়ি এমনভাবে বাঁধা আছি এই ব্যক্তিটির সঙ্গে। ও আমার সব, ও আমার সত্তা। ওর মুখের দিকে চেয়ে তিন তিনটে মানুষ যখন বিস্ময়ে, অনুকম্পায় স্তব্ধ আমি আস্তে আস্তে গিয়ে শুয়ে পড়ি ওর মধ্যে, বিন্দুমাত্র পিছুটান অনুভব না করে। আমার চোখ বন্ধ, আমার মস্তিষ্কে নিদ্রা, আমার হৃদয়ে একই সঙ্গে দুঃখ এবং আনন্দ, আমার রক্তভেজা চুলে এসে পড়েছে বসন্তের উজ্জ্বল রোদ। যে আলো সব দৃশ্যকে এক মায়াময় অবাস্তবতা দেয়, যে আলোকে শংকর বলত, সত্যের অবগুণ্ঠন।